হস্তগত করেছিল বলে গবেষক ... আখ্যায়িত করেছেন। ...শীর লুণ্ঠন বা *Plassey Plunder* বলে আখ্যায়িত করেছেন।

✪ **ব্যক্তিগত সম্পদ নিষ্ক্রমণ ঃ** উপার্জিত অর্থের প্রায় সবটাই কোম্পানির কর্মচারী বা স্বাধীন বণিকেরা স্বদেশে পাঠিয়ে দিত। এজন্য তারা একাধিক পন্থা অবলম্বন করত। যেমন— (১) কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মীরা মূল্যবান পাথর বা হীরে-জহরত ক্রয় করে ইংল্যান্ডে পাঠাত। সেখানে তা বিক্রি করে নগদ অর্থে পরিণত করা হত। (২) বেসরকারি বণিকরা তাদের অর্থ কোম্পানির তহবিলে জমা করে দিত। পরে ইংল্যান্ডে গিয়ে বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কোম্পানির সদর দপ্তর থেকে সেই টাকা সংগ্রহ করে নিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাদের আয়ের গোপনীয়তা থাকত না। তাই তারা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ডাচ, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির কাছে টাকা জমা দিতে শুরু করে। ঐসব কোম্পানি ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্কে তাদের অর্থ হস্তান্তর করে দিত। এই ব্যবস্থায় উভয়পক্ষ লাভবান হয়। ব্রিটিশ বণিকদের আয় ব্রিটিশ কোম্পানির কাছে গোপন থাকে। আবার ঐ অর্থ বিনিয়োগ করে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা বাংলাদেশ থেকে মাল সংগ্রহ করে বাণিজ্য চালাতে সক্ষম হয়। এজন্য এখন আর তাদের স্বদেশ থেকে সোনা, রূপা আনার প্রয়োজন থাকে না। আর সবদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার অর্থনীতি। দেশের সম্পদ বাইরে চলে যায় ; আবার ওলন্দাজ, দিনেমারদের মাধ্যমে যে সোনা-রুপা আমদানি হত তাও বন্ধ হয়ে যায়। (৩) ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পরে ইংরেজ বণিকেরা নিজেদের বাণিজ্যসংস্থা গড়ে তোলে। এগুলিকে বলা হল *'এজেন্সী হাউস'*। অতঃপর বণিকদের অর্জিত সম্পদ স্বদেশে পাঠানোর দায়িত্ব এই এজেন্সী হাউসগুলি পালন করত।

✪ **কোম্পানির অর্থ শোষণ ঃ** ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নানাভাবে বিপুল পরিমাণ

সম্পদ বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে নিষ্ক্রমণ করতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের আগে কোম্পানি মাল কেনার জন্য স্বদেশ থেকে সোনা-রুপা বা বুলিয়ান আমদানি করত। বছরে প্রায় ৮-১০ কোটি মুল্যের বুলিয়ান তারা এদেশে আনত। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব বদলের খেলায় লিপ্ত থেকে কোম্পানি নজরানা হিসেবে বহু অর্থ অর্জন করে। এখন এই অর্থ দিয়ে তারা এদেশে পণ্য ক্রয় করে। ফলে বুলিয়ান আমদানি কমে যায়। এইভাবে চলে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৬৫-তে বাংলার *'দেওয়ানি'* পাওয়ার সূত্রে কোম্পানি বাংলার রাজস্বের অধিকারী হয়। বাংলাকে শোষণ করে তারা কয়েক বছরের মধ্যেই বিপুল উদ্বৃত্ত অর্থের (রাজস্ব) মালিক হয়। নবাবী আমলের শেষ বছরে (১৭৬৪-'৬৫ খ্রিঃ) বাংলার আদায় করা রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড। ঠিক পরের বছরেই তা বেড়ে হল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার পাউন্ড। কোম্পানি নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী ১৭৬৬-১৭৬৮ এই তিন বছরে তারা বাংলা থেকে রাজস্ব বাবদ আদায় করেছিল ৫ কোটি ৭ লক্ষ পাউন্ড। প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে এই রাজস্বের বিশাল অংশ কোম্পানির প্রাপ্য হিসাবে থাকত।

✪ **বিনিয়োগ বা লগ্নী দ্বারা শোষণ ঃ** এখন কোম্পানি ভারতে পণ্য কেনার জন্য স্বদেশ থেকে বুলিয়ান আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে উদ্বৃত্ত রাজস্বের টাকা দিয়ে মাল কেনে এবং ব্যবসা করে। এই ব্যবস্থাকেই বলা হত *'লগ্নী'* বা *Investment*। ১৭৬৫-'৬৬ থেকে ১৭৭০-'৭১ অর্থবর্ষে অর্থাৎ ৬ বছরে কোম্পানি বাংলা থেকে মোট রাজস্ব আদায় করেছিল ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউন্ড। এর থেকে লগ্নী করেছিল ৪০,৩৭,১৫২ পাউন্ড। অর্থাৎ মোট রাজস্বের ৩০ শতাংশেরও বেশি অর্থ লগ্নী মারফত বাংলার বাইরে চলে গিয়েছিল। *দ্বিতীয়ত,* কোম্পানি তার চীনা বাণিজ্যের জন্যও ভারতীয় সম্পদ বিনিয়োগ করত। চীনের সবুজ চা ও সাদা রেশম কেনার জন্য কোম্পানি বাংলা থেকে সোনা-রুপা চীনে পাঠাত। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পর এই বাবদ কোম্পানি বার্ষিক প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার সোনা-রুপা চীনে পাঠায়। পরে অবশ্য আফিমের বদলে তারা চীনের সাথে বাণিজ্য চালিয়েছিল। *তৃতীয়ত,* বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে কোম্পানি তাদের বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক ব্যয় মেটাত এবং ঐ দুই প্রেসিডেন্সীর বাণিজ্যে লগ্নীর জন্য অর্থ সরবরাহ করত। 'সিক্রেট কমিটির' এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, ১৭৭০-'৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই খাতে ২৩,৫৮,২৯৮ পাউন্ড বাংলা থেকে পাঠানো হয়েছিল। *চতুর্থত,* কোম্পানির ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রসার ও রক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভারও বাংলার রাজস্ব থেকে মেটানো হত। 'ইঙ্গ-মারাঠা', 'ইঙ্গ-মহীশূর' ও 'ইঙ্গ-ফরাসি' যুদ্ধে বাংলার বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সর্বোপরি ছিল কোম্পানির অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশ অর্থ। ***ড. জে. সি. সিংহ*** দেখিয়েছেন (Economic Analysis of Bengal) যে, ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি এই খাতে বাংলা থেকে প্রায় ১ কোটি পাউন্ড স্বদেশে পাঠিয়েছিল। ***জেমস্ গ্রান্ট*** তাঁর *'Analysis of the Finances of Bengal'* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজের লগ্নী, চীনা দ্রব্য ক্রয় এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মুনাফা বাবদ বার্ষিক প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বাংলা থেকে চালান হত। প্রিন্সেপ (J. A. Princep)-এর হিসাব অনুযায়ী ১৮১৩-'২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৪ কোটি পাউন্ড।

✪ **ফলাফল :** পলাশী-পরবর্তী একশো বছরে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে হয়েছিল, তার নির্দিষ্ট হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অবৈধ উপায়ে অর্জিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই স্বদেশে পাঠানো হত। তবে এর পরিমাণ যে বিশাল এবং যে বাংলার ক্ষেত্রে সর্বনাশাত্মক—একথা কোন কোন ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তির মুখেও শোনা

বাংলার দুর্গতি

ব্রিটেনের লর্ড-সভার সদস্য এবং একদা ভারতের বড়লাট লর্ড পার্লামেন্টে স্বীকার করেছিলেন (১৮৪০ খ্রিঃ) যে, "ভারত থেকে বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ পাউন্ড ব্রিটেনে আসে, পরিবর্তে ভারত প্রায় কিছুই পায় না।" রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি জন সুলিভান-এর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। লিখেছেন : "আমাদের শাসনব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জধর্মী। এই স্পঞ্জধর্মী শাসন গঙ্গা তীরের দেশ থেকে সকল সম্পদ শুষে নেয় এবং তা টেমস তীরবর্তী দেশে এনে নিংড়ে দেয়।" ("Our system acts very much like a sponge, drawing up all the good things from the Bank of the Ganges and sanerring them down on the banks of the Tames")

✪ **বিরুদ্ধ মত :** ইংরেজের অর্থনীতির সমর্থনে ***স্যার জন স্ট্রাচি*** লিখেছেন যে, ইংরেজ ভারতে শান্তিশৃঙ্খলা বিধান করার মূল্য হিসেবেই অর্থ পেয়েছে, অকারণে নয়। তাঁর মতে, এ অর্থ দ্বারা ইংল্যান্ডে ভারতের জন্য দ্রব্য ক্রয় ও কম সুদে ঋণ সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা ভারতের সমৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। ***থিওডর মরিসন*** *'Economic Transition in India'* গ্রন্থে বাংলার সম্পদ নিষ্ক্রমণকে একতরফা বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, আলোচ্য পর্বে বাংলার রপ্তানি বেড়েছিল। এর ফলে কাঁচামাল উৎপাদকরা লাভবান হয়েছিল। কলে প্রস্তুত সুতো আমদানির ফলে বাংলার তাঁতীরাও লাভবান হয়েছিল। ***পি. জে. মার্শাল***ও তাঁর *'East India Fortunes Bengal'* গ্রন্থে লিখেছেন যে, বাংলার সম্পদ থেকে ইংরেজ যেমন লাভবান হয়েছিল, তেমনি কোম্পানির শাসন বাংলাদেশও তাদের সেবা (Service) ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল। বাংলার প্রশাসন পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ বাংলাকে ব্যয় করতে হয়নি। তাছাড়া কোম্পানির সহযোগী দেশীয় গোমস্তা বা বেনিয়ানরাও এতে উপকৃত হয়েছিল। ***কিন্তু ড. রমেশচন্দ্র দত্ত, এন. কে. সিংহ, ড. অম্লান দত্ত*** প্রমুখ ভারতীয় ইতিহাসবিদ এই যুক্তি মানতে অস্বীকার করেছেন। এঁরা মনে করেন, লুণ্ঠনের সমর্থনে স্ট্রাচির বক্তব্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অর্থনীতির সংজ্ঞা দ্বারা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। মরিসন বা মার্শালের মন্তব্য অন্ধ জাতীয়তাবোধে দুষ্ট। আলোচ্য একশো বছরে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আমদানি হয়েছিল তার থেকে রপ্তানি ছিল অনেক বেশি। তাছাড়া আমদানিকৃত পণ্যাদিও মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পদ নির্গমনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এজেন্সী-প্রথার মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের ফলে উৎপাদকরাও সীমাহীন অবিচারের শিকার হয়েছিল। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। বাংলার আর্থিক ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়েছিল। তাই নিরপেক্ষ কোন কোন ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌ও কোম্পানির এই নগ্ন অর্থনীতি ও সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি।